অপমানের দিন

সরকার মাসুদ

মানুষ সকালের নাশতা সারে রুটি বা পরাটা, পাউরুটি অথবা তেহারি কিংবা ওই জাতীয় খাবার দিয়ে। শুধু ফল দিয়ে নাশতা করার কথা কেউ ভেবেছে কখনো? অথচ আমাদের বেলায় তাই হয়েছিল একদিন। আমরা খালি ফল দিয়ে নাশতা করেছি একদিন। না, কোনো সখের ব্যাপার ছিল না সেটা। তাহলে কি ছিল, কি হয়েছিল সেদিন, একটু খুলে বলি।

সেদিন আমাদের দিন শুরু হয়েছিল অপমানের ভেতর দিয়ে। আমরা অনেক রাতে গিয়েছিলাম মিরপুর। সেখানে আনিস নামে আমাদের এক বন্ধু থাকে। একটা বাড়ির চারতলার এক রুমে একা থাকে সে। মুজিব আর আমি যখন তার দরজায় কড়া নাড়লাম অনেকক্ষণ সাড়া নেই। পরে দরজা খুলেই আনিস ‘ ও আপনারা।’ বলে সরে দাঁড়ায়। তার ওইভাবে সরে দাঁড়ানো এবং ‘ও আপনারা।’ বলার ভঙ্গিই বলে দিয়েছিল সে আমাদের দেখে মোটেই খুশি হয়নি। তার খুশি না হওয়ার ব্যাপারটা আমাকে খুব বিস্মিত করেছিল। মুজিব তার ঘরে এর আগে এলেও আমি এই প্রথম। ভদ্রতা বলেও তো একটা কথা আছে। আমরা তারপরেও ভেতরে ঢুকি। কেননা তখন মধ্যরাত পেরিয়েছে। আমাদের কাছে টাকা-পয়সা খুবই কম। এখানে রাত না কাটিয়ে আর উপায় কি? মুজিব বলেন, শেষ পর্যন্ত এসেই পড়লাম,’ বলে আনিসের মুখের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করে। আনিস বলে, ‘আমার অসুবিধা হয়।’

আমি বিব্রত হয়ে বলি, ‘ওমা। আপনিই না বললেন আসতে!’

দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আনিস জবাব দেয়, ‘আমার সঙ্গে আসাটা ভিন্ন।’ রাত পৌনে দুইটা পর্যন্ত জেগেছিলাম আমরা, ঘরের তিনটি প্রাণী। কিন্তু আনিসের সঙ্গে আমাদের আর কোনো কথাই হলো না, আশ্চর্য। আমরা তার ঘরে ঢোকার কিছুক্ষণের মধ্যে সে বাথরুমে যায় এবং অনেকক্ষণ কাটায়। মুজিব ও আমি মুখ চাওয়া চাওয়ি করি। ভাবি আনিস বাথরুমে এতক্ষণ ধরে কি করছে। গোপনে নেশাটেশা করছে নাতো! কবিদের কেউ কেউ এগুলো করে। আনিসও তো কবিতা লেখে। আজিজ মার্কেটের আড্ডায় কয়েকদফা চা বিস্কুট খেলেও রাতের খাবার খেতে পারিনি আমরা। অথচ ভদ্রতা করে রাতে খেয়েছি কি না জিজ্ঞেস করাতো দূরের কথা, সকালে নাশতা খাওয়ার কথাও একবার বললো না সে। বরং সকাল সাতটা বাজতে না বাজতেই তড়িঘড়ি করে উঠে জামা-কাপড় পরেছে। এমনভাব দেখিয়েছে যেন সাতসকালেই তার কতো কাজ।

ফলে সাতটা তিরিশের ভেতর অগত্যা, আমাদেরকেও বেরোতে হয়েছিল; যদিও ইচ্ছে করছিল আরো ঘন্টা দুয়েক ঘুমাতে। হ্যাঁ, খুব সকালে একজন মানুষের ব্যস্ততা থাকতেই পারে। বন্ধুস্থানীয় কাউকে সময় দেয়ার মতো সময় নাও থাকতে পারে। কিন্তু সেটা মুখ ফুটে, বিনীত ভঙ্গিতে বলাই ভদ্রতা। আনিস আমাদের কিছুই বলেনি। তারচেয়েও দুঃখের আমাদের সাথে সাথেই সে উপর থেকে নামলো, রাস্তা পর্যন্ত একসঙ্গে এলো অথচ রিকশায় ওঠার আগে/পরে ‘আচ্ছা দেখা হবে’ বা এ ধরনের কোনো কথাই বেরোল না তার মুখ থেকে। আনিসের উপর আমার রাগ ফেটে পড়তে চাইছিল। রাগ হচ্ছিল মুজিবের উপরেও। ওর পীড়াপিড়িতেই তো ছেলেটার বাসায় যাওয়া। আমরা অনেকক্ষণ কথা বললাম না। আস্তে আস্তে বাসস্টপের দিকে হাঁটছি। বললাম, দেখলেতো আনিসের ব্যবহারটা। এজন্যই আমি আসতে চাচ্ছিলাম না। ও যে এরকম রুড হতে পারে তা আগেই আন্দাজ করেছিলাম। মুজিব একবার নিচু স্বরে ছিঃ বললো। দ্বিতীয়বার জোরে উচ্চারণ করলো ‘ছিহ’। এই সজোর ‘ছিহ’-এর সঙ্গে এক ফুসফুস ঘৃণা বেরিয়ে মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল বাতাসে।

আমি বললাম, তাহলে বোঝো কী কবিতা লিখবে ও। চড় ই পাখির হৃদয় নিয়ে বড় কিছু সৃষ্টি করা যায় আমি বিশ্বাস করি না।

সে জন্যইতো নিজস্ব কবিতা একটাও লিখতে পারিনি এখন পর্যন্ত, মুজিব বলে অপমানের শেষ কণাটি হজম

করতে করতে। আমি বললাম, 'একজন লোক মাতাল হতে পারে, বেশ্যাবাজ হতে পারে, কিন্তু সে যদি প্রকৃতই কবি হয় মানে শিল্পী হয়, তাহলে তার কথা শুনে তাকে বুকে নিতে ইচ্ছে করবে। পরিস্থিতিভেদে তার মেজাজ বিগড়াতেই পারে কিন্তু সবসময় সে কঠিন ব্যবহার করবে না, আমি এটাই বুঝি।

মুজিব সান্ত্বনার সুরে বলে, বাদ দাওতো। এই স্বার্থপরতার ফলও অচিরেই পাবে। এখন বলো কতো টাকা আছে সাথে?

'১৭/১৮ টাকা হবে।'

বাসস্টপ সংলগ্ন একটা ছোট রেস্টুরেন্টে পরাটা ভাজা হচ্ছে। চমৎকার পরাটা। গন্ধ শুঁকে মন বলে এক্ষুণি ঢুকে পড়ি। কিন্তু নাশতা খেলে ফেরার বাসভাড়া থাকবে না। এখন কী করা যায়। মুজিব বললো, 'চলো বাদলের ওখানে যাই। সকালবেলা ওকে পাবো।

'হ্যাঁ চলো, আমি সায় দিই, 'নাশতাটা ওর ওখানেই সারি।'

মুজিব বলে, বাদলকে পেলে কিছু টাকাও নেয়া যাবে ওর কাছ থেকে।

বাদল। মোয়াজ্জেম হোসেন বাদল। আমাদের ভালো বন্ধু। মুজিবের সাথে খাতির বেশি। আমার সাথে দেখা হয় কম। মিরপুর এগার নম্বরে ওদের পৈতৃক বাড়ি। বাসে চেপে বাদলের উদ্দেশ্যে যেতে যেতে চিন্তা করলাম, দেখা পাবো তো ছেলেটার। ও বেশ ভালো ফটোগ্রাফার। একবার আমার কয়েকটা ছবি তুলেছিল। আজিমপুরের এক দোতলা বাড়ির ছাদের দেয়ালে ঠেস দিয়ে পোজ দেয়া ছবিটা এখনো আমার এ্যালবামে আছে। বাদলের সাথে লাস্ট দেখা হয়েছে কবে? মাস দেড়েক আগে, শ্যামলের বেড়ার ঘরে। যাক বাবা, ভালোয় ভালোয় ওর দেখা পেলেই হয়। নাহলে কপালে দুর্ভোগ আছে। বাস থেকে নেমে কিছুটা পথ এগোতেই আমি বাদলের হাসি হাসি মুখটা একঝলক দেখলাম। শুধু এক ঝলক। আমাকে দেখে তার অভ্যর্থনাসূচক 'আ-রে, সরকার ভাই যে'। শুনতে পেলাম। কিন্তু আসল বাদল এখন কোথায় আমরা জানি না। মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর আমরা গিয়ে থামলাম গাছপালা-বাগানশোভিত একটা দোতলা বাড়ির গেটে। মুজিব নিচু হয়ে গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢোকে। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছি।

বাদলঃবাদলঃ বাদল বাসায় আছো? মরিয়া হয়ে ডাকছে মুজিব। ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখি, সে কোনার দিকের একটা রুমের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে। মুজিব আবার ডাকে, বাদলঃ এই বাদলঃ ছেলেটা শুনতে পাচ্ছে না কেন? মড়ার ঘুম ঘুমিয়েছে নাকি? ওতো আবার গভীর রাতে শোয়।

মুজিব গেট পেরিয়ে এসে হতাশ কণ্ঠে বলে, 'সরকার, মনে হচ্ছে বাদল বাসায় নেই।'
'নেই' শব্দটা চপেটাঘাতের মতো লাগলো। অথচ বাদলকে আমাদের চাই। ওর ঘরের ভেতরটা দেখার আশায় মুজিব আবার ভেতরে ঢোকে, বাগানের পিছন দিকে যায়, কেননা পর্দার কারণে সামনে থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। বিড়ালের নিঃশব্দ পায়ে আমি ওকে অনুসরণ করি। এতক্ষণ ক্ষীণ আশা জেগেছিল। বেঘোরে ঘুমাচ্ছে সে। আমাদের ডাক কানে পৌঁছায়নি। কিন্তু এটাই সত্য যে, আমাদের পুরোপুরি হতাশ করে দেয়ার জন্য অন্য একটি দৃশ্য সেখানে অপেক্ষা করছে তখন। পর্দা একপাশে গুটিয়ে রাখা কাচের জানালা দিয়ে পরিষ্কার দেখা গেল বিছানা খালি। আর বিছানাটা পরিপাটি। তার মানে বাদল ঘরে নেই। ও-কি রাতে বাসায় ফেরেনি? মনে মনে বললাম, কী আশা। নাশতা খাবো, আবার টাকাও নেবো। ভাগ্যের কি পরিহাস, বাদলই নেই। ছেলেটা তাহলে গেল কোথায়? সে এমনিতেই একটু সাত্ত্বিক গোছের। বউ-বাচ্চা আছে। 'আনন্দবার্তা' নামে একটা সিনে ম্যাগাজিনে কাজ করতো। চাকরিটা চলে যাওয়ার পর জীবন যাপনে আরও বেহিসাবি হয়েছে। বাসায় থাকে খুম কম। মাঝে মাঝে তাকে মিরপুরের মাজারে, ফিরোজ সাঁই-এর আড্ডায় পাওয়া যায়। সারারাত কাটিয়ে ভোরের দিকে বাসায় ফেরে। কিন্তু এখন বাজে সোয়া আটটা। এখনও বাদল ফেরেনি। ঢাকার বাইরে কোথাও যায়নিতো।

দশ নম্বর গোল চক্করে এসে আমরা অতঃপর ফার্মগেট গামী ডাবল ডেকার ধরি। বাসে প্রচণ্ড ভিড়। কোনোরকমে পাদানিতে উঠেছিলাম। উঠেই সিদ্ধান্ত নিই ভাড়া দেব না। মানে ভাড়া ফাঁকি দেব। আছেই মাত্র আঠার টাকা। দু'জনের ভাড়া দিলে থাকবে ১০ টাকা। এই টাকায় নাশতা কিনতে পারবো না, কিন্তু অন্যকিছু তো খাওয়া যাবে। কাজেই কন্ডাক্টর যে দিকের লোকের ভাড়া কাটা শেষ করেছে, আমি ভিড়ের ভেতর কৌশলে সেই দিকে আস্তে আস্তে সরে যেতে থাকি। এক সময় লক্ষ্য করি কন্ডাক্টর সামনে এগিয়ে গেছে। আমি নিরাপদ বোধ করি এবং প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে টাকা ক'টার অবস্থান বিষয়ে নিশ্চিত হই। ডাবল ডেকার দ্রুতগতিতে ফার্মগেট পৌঁছে গেল। এই ফার্মগেট এমন জায়গা যেখানে এলেই জীবনের দৌড় অন্তর দিয়ে অনুভব করা যায়। এখানে মানুষ খালি দৌড়ায়, বাসের উদ্দেশ্যে, স্কুল-কলেজের উদ্দেশ্যে, অফিসের উদ্দেশ্যে। ওভারব্রিজের গোড়ায় দাঁড়ালে ছবিটা আরো স্পষ্ট। মানুষ উঠি পড়ি করে ছুটছে। হুড়মুড় করে নামছে। 'সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র'-এর পাশ দিয়ে যেতে যেতে মুজিব বলে, 'সরকার একটা সিগারেট কেনো।'

বাসে ওঠার আগে একটা খেয়েছি। এখন আবার চাইছে। যদিও বললাম 'খালি পেটে এত সিগারেট খেও না', তবু একটা স্টারফিল্টার কিনতে হলো আবার। আনন্দ সিনেমাহলের সামনে ঝুড়িতে পেয়ারা নিয়ে বসেছে দু'জন লোক। পেয়ারাগুলো বেশ আর রসালো। আট টাকা দিয়ে আমরা এক হালি পেয়ারা কিনলাম। ক্ষুধায় পেট জ্বলছে তখন। পেয়ারাঅলার খুব কাছে, ফুটপাতের উপর একটা লোক শার্ট বিক্রি করছে। পুরনো বিদেশি শার্ট। তা হোক। জামাগুলো কিন্তু নতুনের মতো, মানও বেশ ভালো। মুজিব ঠোঁট থেকে সিগারেট ফেলেনি। পেয়ারা খাচ্ছে, সিগারেটও খাচ্ছে। পেয়ারা চিবাতে চিবাতে আমি বলি, 'শার্টগুলোর কালার দেখেছ? আভিজাত্য আছে। স্ট্রাইপও চমৎকার। সাথে টাকা থাকলে মিস করতাম না'।

পেয়ারা খেতে খেতেই মুজিব ছোট্ট করে বলে, 'হ্যাঁ' এবং ঐ 'হ্যাঁ'-এর সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশব্দ হাসি। মুজিবের এই হাসিটা বড় রহস্যময়। রহস্যময় সুন্দর হাসি। হাসি এমন এক মানবিক এক্সপ্রেশন যার ভেতর দিয়ে আপনি 'হ্যাঁ' অথবা 'না' কোনটাই বোঝাতে না-চাইতে পারেন। যদি কাউকে পাত্তা না দিতে চান স্মিত হাসুন। কারো বিব্রত প্রশ্নের জবাব এড়াতে চান? রহস্যময় হাসুন। নিঃশব্দ হাসির মতো বহুরূপী উত্তর আর কি আছে?

কাছেই কাওরানবাজার। তিতাস গ্যাসের উল্টোদিকে 'সংস্কৃতিপত্র'-র অফিস। ইকবাল করিম ওখানে বসেন। এই ভদ্রলোক কবি। বেশ নাম-ডাক আছে। যতদূর বুঝেছি মনটা আর দশজনের মতো কুটিল নয়। ভালোবাসতে জানেন। পারতপক্ষে উপকারও করেন মানুষের। তো বেলা এগারটার সময় সেই ইকবাল করিমের টেবিলে বসে আছি। মুজিবের মুখ মলিন। গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। তাকে বিপন্ন লাগছে। আমারও মেজাজ ভালো নয়। জোর করে স্বাভাবিক ভাব ফুটিয়ে আছি। ইকবাল ভাই বললেন, 'কি মন খারাপ?' জবাবে আমি কেবল ম্লান হাসলাম। মুজিব কথা বলছে না। কোণার দিকে একাউন্টস সেকশনে ছোট-খাটো ভদ্রলোকটি টেলিফোনে কথা বলছেন। তার শব্দ পাচ্ছি। সেলিম নামের একটা ছেলে ইকবাল করিমকে একটা কাগজ দিয়ে গেল। মুজিব নীরবতা ভেঙে, যেন কিছু একটা না বললে ভাললাগছে না বলে, 'ইকবাল ভাই চা খাবো।'

আমি তার সাথে যোগ করি, খালি চা না। বিস্কুটও।

ইকবাল করিম বলেন, 'সিওর। চা বিস্কুট আনাচ্ছি তোমাদের জন্য।'

আমি এখন ভাবছি কি করে ইকবাল ভাইকে বলা যায় মানে আমাদের কপর্দকশূন্য অবস্থার কথাটাঃ পেয়ারা দিয়ে নাশতা করাঃইত্যাদি।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে মুজিব দু'বার ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি ফেলে আমার চোখে। অর্থাৎ এইতো সময়। সৌহার্দ্যের মুহূর্তেই প্রয়োজনের কথা পাড়া উত্তম। চা শেষ করে ইকবাল করিম সিগারেট ধরালেন। আমাদেরকেও

দিলেন একটা করে। তার মুখে তখন মেলা প্রসঙ্গ। দেশটা গোলস্নায় গেছে। মানুষ যা খুশি তাই করছে। আইন-শৃঙ্খলা মূল্যবোধ বলে আর কিছু নেই। রাজনীতিবিদদেরও যদি এক ছিটে দেশপ্রেম থাকতো। তারা শুধু জানে ডায়াসে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে। তোষামোদ আর স্বজনপ্রীতি করতে করতে শিল্প-সাহিত্যেরও বারোটা বাজা সারা। এই সমস্স্ত গভীর হতাশা ও বেদনার কথা আমরা অন্স্তর দিয়ে উপলব্ধি করছিলাম। ইকবাল ভাইয়ের ড়্গোভের কারণগুলো খুবই স্পষ্ট। আর এও টের পাচ্ছিলাম যে, আজ আর হবে না। কিছুতেই তাকে আজ বলতে পারবো না আমাদের অবস্থার কথা। ভদ্রলোক চা বিস্কুট খাওয়ালেন, সিগারেট খাওয়ালেন। এখন আবার টাকার প্রসঙ্গঃ। না না সেটা খুব খারাপ দেখাবে। অফিসের গেট পেরিয়ে রাস্স্তায় নামতেই মুজিব বলে, কি ব্যাপার, ইশারা দিলাম, তারপরও কিছু বললে না যে? কী বলবো? নিজের চোখেইতো দেখলে। ঐ অবস্থায় কি করে টাকা চাই? আমি যখন-তখন টাকা-পয়সা চাইতে পারি না মানুষের কাছে। মুজিব প্রায় স্বগতোক্তির মতো বলে, ‘তোমার অবস্থা দেখতেছি আমার মতই।’

একই বিল্ডিংয়ের কম্পিউটার সেকশনে কাজ করে রোকন আমার কাজিন। ওর কথা একদম খেয়াল ছিল না। ‘সংস্কৃতিপত্র থেকে বেরিয়ে আসার মুখে হঠাৎ মনে পড়ে। আমি মুজিবকে একটু দাঁড়াও টয়লেট সেরে আসছি বলে রোকনের উদ্দেশ্যে পা বাড়াই। রোকনকে পেয়েছিলাম। টাকা পাইনি।

ব্যর্থতার গস্নানি বড় সাংঘাতিক। মন ভেঙে দেয়। বিশেষত কোনো কাজ বারবার চেষ্টা করেও যখন হয় না, তখন তা মানুষকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয় যেন। এতড়্গণে মনটা বিষিয়ে উঠেছে। তেতো মুখে বললাম, মুজিব তোমার একজন বন্ধু আছে না, মতিঝিলে কোন ব্যাংকে জব করে? ওর ওখানে গেলে কাজ হবে?

মুজিব বলে, হ্যাঁ জুয়েলের কথাই ভাবছিলাম। দেখা যাক। ওই শেষ ভরসা।

আমরা বাংলা মোটরের দিকে হাঁটতে থাকি। আমাদের পকেট প্রায় শূন্য। ৩/৪ টাকা আছে। বড় জোর বাস ভাড়া হবে। আমরা বাংলামোটর থেকে সায়েদাবাদগামী মিনিবাস ধরার জন্য নতুন সোনারগাঁ রোড ধরে হাঁটতে থাকি।

শাপলা চত্বর থেকে টিকাটুলির দিকে পঞ্চাশ/ষাট গজ এগোলে ডান দিকে পড়ে এলিকো ভবন। তার বাঁ পাশের বিল্ডিংটাই গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক। মুজিবের বন্ধু জুয়েল ওখানেই চাকরি করে। ভেতরের দিকে কাচঘেরা জায়গায় ঝকঝকে একটা টেবিলে সে বসে। মুজিবের বাল্যবন্ধু। মুজিবের মাধ্যমেই আমার সঙ্গে আলাপ। মাঝে মধ্যে শাহবাগের বইপাড়ায় দেখা যায়। অত্যন্স্ত ভদ্র। অত্যন্স্ত সদালাপি। দেখা হলেই স্মিত হেসে বলবে, ‘কেমন আছেন সরকার ভাই?’ আমরা ব্যাংকের সামনে পৌছুতেই মুজিব বললো, ‘সরকার ভেতরে যাও।’ আমি বললাম, তুমি যাও।’

‘না না তুমি যাও।’

আরে বাবা, জুয়ের তোমার বন্ধু তুমিই যাও।

মুজিব নাছোড়বান্দা। বলে, অসুবিধা আছে বুঝছো না কেন? ভেতরে গিয়ে জুয়েলকে আমার কথা বলো।’

কি আর করা। আমাকেই যেতে হলো শেষে। জুয়েল আমাকে দেখেই কাঁচঘেরা চেম্বারে উঠে দাঁড়ায়। আমি বলি, ‘বাইরে মুজিব আছে।’

জুয়েল বলে, ‘বিশ মিনিটের ভেতর আসছি।’

বাইরে, লাইটপোস্টের নিচে, বারোভাজার, দোকানের সামনে মুজিব দাঁড়ানো। সিগারেট খাচ্ছে। আমাকে বেরিয়ে আসতে দেখেই চোখে মুখে উদ্বেগ ছড়িয়ে বলে জুয়েল আছে না?

‘আছে’। সুসংবাদটা দিয়েই ওকে জিজ্ঞেস করি, ‘সিগারেট কিনলে কি দিয়ে’? মুজিব ঠোঁটের কোণে হাসে। বলে, ‘দুটো কয়েন ছিল পকেটের তলায়। খালি পেটে ছেলেটা এত সিগারেট টানে কি করে? আমার অবাক লাগে। পেয়ারা দিয়ে অবশ্য নাশতা হয়েছে। তার আধা ঘন্টা পর দু’টো করে বিস্কুট। কিন্তু এক জোড়া পেয়ারা আর এক জোড়া নোনতা বিস্কুট পেটে কতক্ষণ থাকে? ক্ষুধা আবার মাথা চাড়া দিতে শুরু করেছে। তা করুক। জুয়েলকে পেয়ে আমরা আশ্বস্ত হয়েছি। আমাদের আর চিন্তা নেই। কিন্তু আধাঘন্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরও জুয়েল আসছে না। আসছে না কেন? খুব কাজের চাপ? এসব অফিসে বরাবরই খুব ব্যস্ততা। তার উপর এখন পিক আওয়ার। আমরা ভাবি, নিশ্চয়ই একটু পরে ও বেরোবে। পঞ্চাশ মিনিট পেরিয়ে গেল। জুয়েলের দেখা নেই। কী করছে ছেলেটা এখন। আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। অসহিষ্ণুতা আমাদের ঘিরে ধরে।

মতিঝিলের ফুটপাতে হকাররা বসে গেছে নানা জিনিসের পসরা সাজিয়ে। পথচলতি মানুষ হঠাৎ থেমে, ঝুকে এটা ওটা দেখছে। জুয়েল আসছে না। অগুণতি বাস, রিকশা গেলে চোখের সামনে দিয়ে। গেল অসংখ্য মানুষ। জুয়েল এলো না। ঘড়ির কাটা জোড়হাতে নমস্কার জানাতে এগিয়ে চলেছে বারোটার দিকে। জুয়েল আসছে না। কোকাকোলার ছবিঅলা বিশাল এক গোল বেলুন উড়ছে বিদ্যুৎ ভবনের আটতলার ছাদে। জুয়েল কখন বেরোবে? মুজিবকে বললাম,

‘তোমার জুয়েল আমাদের কথা ভুলে যায়নি তো?
‘আরে না, ও সেরকম ছেলে না।’

‘তাহলে এত দেরি করছে যে!’

‘নিশ্চয়ই কোনো ঝামেলায় পড়েছে। একটু দেখে আসবে?’

‘জ্বি না। এবার তুমি যাবে।’

বললাম বটে। কিন্তু আমি জানি মুজিব যাবে না। ও বড় একগুঁয়ে। আমি ভাবি, মুজিব ব্যাংকের ভেতর যেতে চায় না কেন। মুখে তিনদিনের না কামনো দাড়ি। যে জামাটা পরে আছে সেটাও বেশ ময়লা। এক মাথা চুল উস্কোখুস্কো। মুখটা মলিন। ওকে এ মুহূর্তে ঠিকভদ্রলোক ভদ্রলোক লাগছে না। ব্যাংক বলে কথা। যদি নিরাপত্তাকর্মীরা অন্যরকম কিছু সন্দেহ করে বের করে দেয়, কিংবা ঢুকতেই না দেয় এসব ভেবেই কি সে জুয়েলের অফিসে যেতে চাইছে না? নাকি অন্য কারণ আছে যা একান্তই ব্যক্তিগত এবং রহস্যময় আত্মাভিযানের সঙ্গে যুক্ত? টেনশনের কারণে এতক্ষণ ক্ষুধা ঠিকমতো বোঝা যায়নি। এখন আবার তা পেটের ভেতর ঘাঁই দিয়ে উঠলো। যেন নিস্তরঙ্গ পুকুরে মাঝারি আকৃতির একটা মাছ উপরে উঠে পানি নাড়িয়ে দিয়ে আবার নিচে নেমে গেছে। তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। ব্যাংকের সামনে ছোট চায়ের স্টল।

‘বাকিতে রুটি খাই? জুয়েল এলে দাম দিয়ে দেবো’ বলা মাত্র মুজিব

‘না না’ করে ওঠে। নিজের প্রতি এবং সম্ভবত পারিপার্শ্বিক সমস্ত কিছুর উপর সে মহাবিরক্ত।

‘হুউর’। খুব বাজে লাগছে! চুলকানোর জন্য চোয়ালের নিচে তার আঙুল উঠে আসে। আঙুল আস্তে আস্তে নড়ে।

একটার পর একটা রিকশা এগোচ্ছে। রিকশার পিছনে রিকশা। তার পিছনে রিকশা। তার পিছনেঃ। আরো আছে মিনিবাস। আছে গেটলক। বিরতিহীন। আছে লোকাল। মাঝে মাঝে টেম্পো এবং বড় বাস। রিকশা-টেম্পো-বাস মিনিবাস পায়ে চলা মানুষ, মটর সাইকেল, চিৎকার-চেঁচামেচি সব মিলিয়ে মতিঝিলের দ্বিপ্রাহরিক মঞ্চে এখন চলছে প্রতিদিনের অনিবার্য জীবনযুদ্ধ। তোমার পছন্দ হোক চাই না হোক তুমি একবার রাস্তায় বেরোলে এই নাটকে অংশ নিতে বাধ্য। শাপলা চত্বরের দিকে একটা শোরগোল উঠলে মানুষ ‘কি হইছে কি

হইছে' বলে কৌতূহলী হয়। রোদ ধূলা ধোঁয়া গ্যাসের সম্মিলিত রূপ এক অতিপাতলা মলিন চাদরের আকার নিয়েছে মাত্র ২৫/৩০ হাত দূরে। পেটের ভেতর ক্ষুধা আরেকবার খলবল করতেই ওই মলিন চাদর ঈষৎ দুলে ওঠে। কানের ভেতর মৃদু কিন্তু অনবরত শোঁ-শোঁ-শোঁ-শোঁ আওয়াজ। মুজিবকে এত রোগা লাগছে কেন? ওতো এত রোগা না। অদূরে, রাস্তার ডানপাশে গাড়ি পার্কিং-এর জায়গায় গা ঘেঁষাঘেষি করে দাঁড়িয়ে আছে নানান মডেলের ৪/৫টি কার। লাল। সাদা। নীল। কালো। জলপাই। খয়েরি। সরু মুখ। চ্যাপ্টা মুখ, গোলা মুখ, চৌকো মুখ সব গাড়ি। কয়েকবছর আগেও এত গাড়ি ছিল না। বাংলাদেশের কিছু মানুষের প্রচুর টাকা হয়েছে। নিশ্চয়ই এর পিছনে ক্রাইম আছে। নইলে গরিব দেশে এত এত দামি গাড়ি কেন? অর্থ আর প্রতিপত্তির ধান্ধায় মানুষ কেমন ছুটছে দ্যাখো। সকালে ছুটছে। দুপুরে ছুটছে। বিকেলে ছুটছে। রাতেও ছুটছে। কিন্তু আমরা এখানে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কি ঘাস কাটছি? দু'জন মানুষ। আমাদের পকেটে এ মুহূর্তে দু'টাকাও নেই। উজবুকের মতো অপেক্ষা করছি বন্ধুর সাহায্যের আশায়। কখন সে বেরোবে। কখন সে দয়া করে আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত করবে। জুয়েল কিছু নগদ পয়সা দিলেও দিতে পারে। কিন্তু আমাদের পকেটে টাকা নেই কেন? কেন এত অল্প টাকা নিয়ে চলাফেরা করতে হয় আমাদেরকে? মুজিব না হয় বেকার। আমিতো চাকরি করি। চাকরি। আর হ্যা, এমন চাকরি, এমন দায়িত্বের কাজ সেটা যে, এই মার্কেটের বাজারে তার পারিশ্রমিক হওয়া উচিত কমপক্ষে তিরিশ হাজার। কিন্তু বেতন পাই কতো? মাত্র উনিশ হাজার। তাছাড়া আমি তো একা নই। আমার সঙ্গে আছে আরও তিনটি প্রাণী। আর কষে কষে পয়সা খরচ করতে আমি পারি না। মাসের শেষে হাতে টাকা থাকবে কি করে?

গোঁ গোঁ শব্দ তুলে একটা ট্রাক আসছে। ফোর্ড কোম্পানির বিশাল আকৃতির হলুদ ট্রাক। ট্রাক তো না যেন বুলডোজার। এর সামান্য টোকাতেই গুঁড়িয়ে পড়বে দোকানপাট, মানুষের ঘাড়, মাথা। ওটার চাকার নিচে পড়লে ওপারে যেতে লাগবে এক সেকেণ্ড। আমি ভাবি বেহিসাবী জীবনের এই যন্ত্রণা বয়ে বেড়াতে হবে সারাজীবন? বেঁচে থাকা মানেই তো একটা পাথরের বস্তা টেনে বেড়ানো, এক দরজা থেকে আরেক দরজায়। নিজেকে এত তুচ্ছ লাগেনি আর কোনদিন। আপন অস্তিত্বকে এতটা অপ্রয়োজনীয় মনে হয়নি আর কখনোই। হোমরা-চোমরা হলুদ ট্রাকটা এখন আমাদের একদম সামনে। এক দৌড়ে গিয়ে ওর চাকার নিচে মাথাটা গলিয়ে দেব নাকি? হঠাৎ মুজিবের 'এই সরকার'। আমাকে আত্মমগ্নতা থেকে এক ঝটকায় নিয়ে ফেলে কংক্রিটের ওপর, 'ঐ যে জুয়েল বেরিয়েছে। ডাক দাও।'

দেখি ব্যাংকের সামনের পেভমেন্টে ছেলেটা দাঁড়িয়ে। পাশে একজন মহিলা। দীর্ঘ অপেক্ষার পর ছেলেটা বেরোল যদিও এখন আবার মেয়েমানুষ এসে জুটেছে। কিন্তু ও আমাদের কাছে আসছে না কেন? দেখা গেল জুয়েল হাঁটতে শুরু করেছে। সঙ্গে মেয়েটাও হাঁটছে। মুজিবকে জিজ্ঞেস করলাম, মেয়েটা কে?

শীতল গলায় মুজিব বলে, 'ওর কলিগ সম্ভবত।'

জুয়েল আমাদের লক্ষ্য করছে কিনা বোঝা গেল না। দেখতে দেখতে ও অনেকদূর এগিয়ে গেছে।

ভিড়ের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলে বিপদ, এই আশঙ্কায় মুজিব একেবার শেষ মুহূর্তে- 'এই জুয়েল' বলে জোরে ডাক ছাড়ে। জুয়েল থমকে দাঁড়ায়। বলে 'এক মিনিট'। তারপর হাতের ইশারায় বোঝায় যে, সে এক্ষুণি আসছে। মনে আছে, এর আগে একবার বিশ মিনিটের কথা বলে অফিস থেকে বেরিয়েছিল একঘন্টা পর। এবার তার 'এক্ষুণি'র অর্থ কতক্ষণ কে জানে। তবু আমরা অপেক্ষা করতে থাকি। আমাদের অপেক্ষার প্রহর শেষ হতে চায় না। অপেক্ষা করি, কেননা আমরা প্রায় কপর্দকশূন্য এবং আমাদের পেটে রাক্ষসের ক্ষুধা। ক্ষুধায় ক্লান্তিতে অপমানে ধিক্কারে আমরা মাটির ভেতর সেঁধিয়ে যেতে থাকি। দোকানপাট যানবাহনের সারি, আশপাশের ভবনসমূহ সবকিছু এ মুহূর্তে ধোঁয়া ধোঁয়া। সবকিছু অতিভঙ্গুর, যেন টোকা দিলেই ধসে পড়বে সিগারেটের লম্বা ছাই। আমাদের ঘাড়, মেরুদণ্ড, হাত-পা ধীরে ধীরে ভেঙে আসতে থাকে। আমরা ক্রমশ মাটির ভেতর সেঁধিয়ে যেতে থাকি।